ভাষার সীমানা ও ভাষাতীতের ধারণা: লুডভিগ ভিটগেনষ্টাইন

প্রিয়ম্বদা সরকার

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন লুডভিগ জোসেফ জোহান ভিটগেনষ্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১)। তরুণ বয়সে লেখা তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ট্র্যাক্টেটাস-লজিকো-ফিলোসফিকাস* ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* আজ সারা বিশ্বে দর্শনের আকর গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। যুগান্তকারী বৈপ্লবিক এই বই দু-খানি পরস্পরবিরোধী বলেই দর্শনের জগতে আখ্যাত।

ট্র্যাক্টেটাস- এ আমরা দেখি যে তিনি জগৎ, চিন্তন ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে এক অসামান্য পূর্বতঃসিদ্ধ দর্শন রচনা করেছেন। অপরদিকে *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্-* এ ভাষা আমাদের দৈনন্দিনের দৈশিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই পার্থক্য আমদের বোঝায় যে, তরুণ ডিটগেনষ্টাইনের ভাষা সম্পর্কিত পূর্বতসিদ্ধ ধারণা পরিণত বয়সে কতটা পরিবির্তিত হয়েছিল!

শুধু তাই নয় আমরা আরো লক্ষ্য করি, দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে যে মত তিনি প্রথম জীবনে অবিসম্বাদিত সত্য হিসেবে মেনেছেন, পরবর্তী কালে তিনি সেই মতকে দূরে ঠেলেছেন, আর জীবনের শেষে যে মতকে গ্রহণ করেছেন— তা তাঁর আগের মতের বিরুদ্ধ মত না হলেও বিপরীত মত তো বলাই যায়। *ট্র্যাক্টেটাস-* এ আমরা দেখি যে তিনি বলছেন: সমাধানহীন দার্শনিক সমস্যাগুলির আসলে ভাষার যুক্তিকে ঠিক ঠাক বোঝার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো 'ভাষার যুক্তি' বলতে ভিটগেনষ্টাইন কি বুঝেছেন? মনে রাখা দরকার এই প্রসঙ্গে যে *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* - এ তিনি দার্শনিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষা ও তার যুক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, বলেছেন ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, যদিও ভাষার ধারণাটি এই দুই গ্রন্থে একেবারেই ভিন্ন।

যাইহোক, *ট্র্যাক্টেটাস-* এ তাঁর যে চিন্তাটি গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল ভাষায় নিহিত যুক্তিকে অনুধাবন করা মানেই হল— ভাষাতে আমরা অর্থপূর্ণভাবে, স্পষ্টভাবে কি বলতে পারি— তার সীমা নির্দেশ করা। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ভিটগেনষ্টাইনের মতে, 'কিছু বলা যায়' মানেই হল, 'তা যুক্তি সম্মতভাবে চিন্তা করা যায়'। তাই কেউ যদি ভাষার স্বরূপ যথাযথভাবে অনুধাবন

করে, সে উপলব্ধি করে যে অর্থপূর্ণ ভাষার সীমা ও চিন্তার সীমা শেষ অব্দি এক সমে এসে মিলে যায়। আর অর্থপূর্ণতার সীমার বাইরে যা পড়ে থাকে— তা সবই হয় অর্থহীন। ট্র্যাক্টেটাসের তাৎপর্য তাই লেখক সূত্রাকারে এভাবেই দিয়েছেন:

> যা কিছু বলা সম্ভব— তা স্পষ্ট করেই বলা সম্ভব। যা বলা সম্ভব নয়— তা সর্ম্পকে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়।[১]

অর্থাৎ যা বলা যায়, তা স্পষ্ট করে বলা যায়। তার থেকে যা বলা যায় না— তাকে আলাদা করা দরকার। স্পষ্টভাবে, অর্থপূর্ণভাবে যা বলা সম্ভব আর যা বলা সম্ভব নয়— তার মধ্যে একটা সীমারেখা টানা দরকার। বস্তুতঃ ভিটগেনষ্টাইন ট্র্যাক্টেটাসে এই কাজটাই করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ভাষার সীমানা টানতে চেয়েছেন ট্র্যাক্টেটাসে— তাই সেই সীমানার অপর প্রান্তে যে ভাষাতীতের অবস্থান- তাকে কেন্দ্র করেই তাই ভাষ্যকারদের মধ্যে কূটতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আজকে আমরা 'ভাষার সীমানা' ও ভাষাতীতের প্রতি ভিটগেনষ্টাইনের মনোভাব কি ছিল যা তার জীবনের দুই পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে— তা নিয়েই আলোচনা করবো। তাই এই প্রবন্ধটি দু-টি পর্বে বিভক্ত— প্রথম পর্বে আমরা ট্র্যাক্টেটাসের ভাষার সীমানা ও ভাষাতীত সর্ম্পকে ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করবো আর দ্বিতীয় পর্বে দেখবো *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* - এ তিনি কিভাবে এ বিষয়গুলিতে নিজের আগেকার অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

ট্র্যাক্টেটাস ও ভাষার সীমানা: ট্র্যাক্টেটাসে তিনি ভাষাতে অর্থপূর্ণতার সীমানা টেনে অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন— যা আমরা নীচের ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুলে ধরছি:

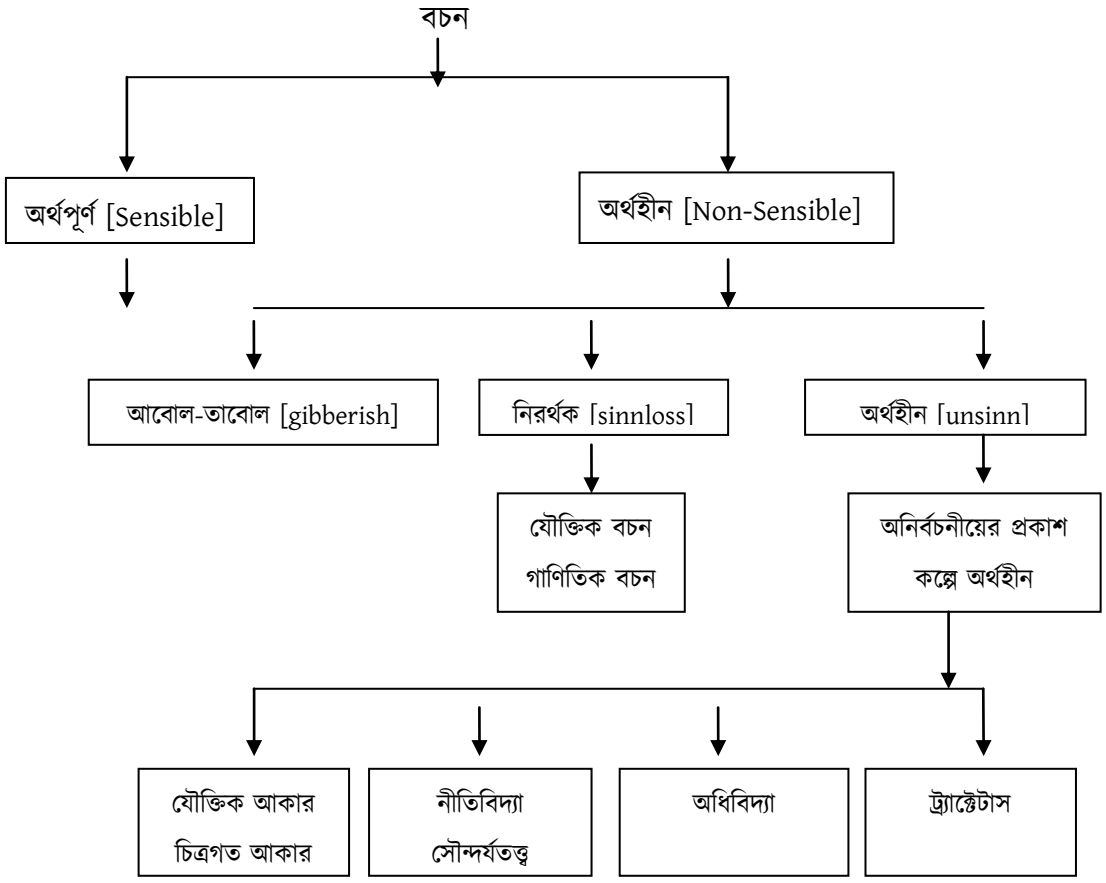

ট্র্যাক্টেটাসীয় অর্থতত্ত্ব অনুসারে আমারা সেই বচনকেই অর্থপূর্ণ বলবো যে বচন জগতের কোন তথ্যকে প্রতিবিম্বিত করে। যদি সে বচন জাগতিক ঘটনাকে যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত করতে পারে, তবে তা সত্য বচন আর যদি সে তা না পারে, তা মিথ্যা বচন। এবারে আসি সীমানার ওপারে যে ভাষাতীত, তার আলোচনায়। যৌক্তিক বচন বা গাণিতিক বচনের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি, ভিটগেনষ্টাইন sinnloss কথাটি ব্যবহার করেছেন, যাকে বাংলা ভাষায় নিরর্থক বলা যেতে পারে। এই বচনগুলি নিরর্থক এই কারণে যে, তারা জাগতিক কোন ঘটনার চিত্ররূপ নয়, তবুও কিন্তু তারা ট্র্যাক্টেটাসীয় বিচারে গুরত্বহীন নয়। এই যৌক্তিক বা গাণিতিক বচনগুলি

চিন্তন, ভাষা ও জগতের যৌক্তিক আকারের মিলটুকুকে দেখায়— তাই এরা নিরর্থক হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ যা অর্নিবচনীয় বা ভাষাতীত, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে যে ধরনের অর্থহীনতার উদ্ভব হয়, তা হল 'উনসিন' (Unsinn)। আমরা আগেই দেখেছি যে, ট্র্যাক্টেটাসে অর্থপূর্ণ ভাষা স্বরূপতঃই বর্ণনযোগ্য— জাগতিক কোন কিছুর বর্ণনাই ভাষায় অর্থপূর্ণতার মানদণ্ড।

কিন্তু এই মানদণ্ড স্বীকার করে নিলে নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এমনকি ট্র্যাক্টেটাসের বচনগুলিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ প্রকৃতই তারা বর্ণনামূলক বচন নয়। শুধু তাই নয়, এই বচনগুলি (অর্থাৎ নৈতিক, নন্দন-তাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক এবং একই সঙ্গে ট্র্যাক্টেটাসের বচনগুলি) শুধু যে কিছুই বর্ণনা করে না, তাই নয়— বচনগুলির বক্তব্য বিষয় এমনই যা কখনো বর্ণনযোগ্য হয় না। তাই তারা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করতে চায়— তা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই বচনগুলি অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করা, ভাষাতীত যে অব্যক্ত, তাকে ভাষায় ব্যক্ত করার এক অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। এই অক্ষম প্রচেষ্টাগুলি এই বিশেষ ধরণের অর্থহীনতার পরিবেশক।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে 'অর্থহীন' শব্দের অর্থ অ-গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এগুলি যে তাঁর বিচারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে লুডভিগ ফন ফিকার কে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে। তিনি লিখছেন

> "ট্র্যাক্টেটাসের প্রস্তাবনায় আমি একটি বাক্যকে অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছিলাম, সেটি এখন প্রকাশিত পুস্তকে নেই, বা অর্ন্তভুক্ত হয়নি, সেটি আমি তোমার জন্য লিখছি। কারণ সেই বাক্যটিই হবে তোমার ট্র্যাক্টেটাসের রহস্যভেদের চাবিকাঠি। যা আমি লিখতে চেয়েছিলাম, তা হল— আমার কাজ মূলত দু-টি অংশ দ্বারা গঠিত— একটি অংশ হল— যা আমি লিখেছি এই বইতে আর অপর অংশটি হল— যা আমি লিখতে পারিনি, এবং যা আমি লিখতে পারিনি, সেটাই আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই বই যেন ভিতর থেকে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রের সীমারেখা টেনেছে এবং আমি স্থির নিশ্চিত যে এই সীমা টানার এটাই একমাত্র কঠোর উপায় বা রাস্তা। সংক্ষেপে, আমি বিশ্বাস করি যে আমি এই সব বিষয় সম্বন্ধে চুপ থেকে বা কোন মন্তব্য না করে— আমি আমার বই এর সবকিছু ঠিকঠাক

জায়গায় রাখতে পেরেছি। তোমাকে আমি এই বই এর প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তটুকু পড়তে বলবো— কারণ সেখানেই এই বই এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত আছে।"[২]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে এটুকু পরিষ্কার যে, যে বচন জাগতিক তথ্যমূলক বিবৃতি নয়, সে বচন বা অবধারণ ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী তাৎপর্যহীন, যদিও তাদের তাৎপর্যহীনতা তাদের গুরুত্বকে কম করে দেয় না। ভিটগেনষ্টাইন ট্র্যাক্টেটাসের মুখবন্ধ ও সিদ্ধান্ত পড়তে বলেছেন। মুখবন্ধে তিনি চিন্তার তথা ভাষার সীমারেখা টানার কথা বলছেন আর সিদ্ধান্তে জানাচ্ছেন যে ট্র্যাক্টেটাস বইটিও তার নিজস্ব মানদণ্ডের প্রেক্ষিতেই অর্থহীন বা Unsinn.

একটু নজর করলেই বোঝা যায় যে, যৌক্তিক দর্শনের এই আকর গ্রন্থটিতে Unsinn বা অর্নিবচনীয়ের প্রকাশকল্পে অর্থহীন যে বিষয়গুলি, সেগুলি সর্ম্পকে বিশদ আলোচনা প্রায় নেই বলেই চলে। বইটির শেষের দিকের ৫/৬ পাতায় এর বিক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আলোচনার মূল বক্তব্য হলো ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী এ জগৎ হল তথ্যসমুদায়। অথচ প্রকৃত অর্থে নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব- সবেরই আলোচ্য বিষয় তথ্য-অতিবর্ত্তী, সে কারণেই তথ্যসমুদায়ের যে জগৎ- তারও অতিবর্ত্তী। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ভিটগেনষ্টাইন এখানে প্লেটোর মতো তথ্য-অতিবর্ত্তী অতিরিক্ত কোনও জগৎ মেনেছেন, যেখানে নৈতিকতা, নান্দনিকতা ও ঈশ্বরের অবিচলিত অধিষ্ঠান। না, তিনি সেরকম কোন জগৎ মানেন নি।

বস্তুতঃ এ প্রসঙ্গে তরুণ ভিটগেনষ্টাইনের বক্তব্যকে বুঝতে গেলে আমাদের যে চিঠিতে ভিটগেনষ্টাইন রাসেলের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তার শরণাপন্ন হতে হবে। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

"তুমি কিন্তু আমার বই এর মূল বক্তব্যটি ধরতে পারো নি। যৌক্তিক বচন সংক্রান্ত আলোচনা আমার বই এর মূল বক্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। আমার মতে 'যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় আর যা প্রকাশ করা যায় না— অর্থাৎ যা বলা যায় আর যা বলা যায় না— তার মধ্যে পার্থক্য করাটাই হল দর্শনের প্রধান সমস্যা।"[৩]

এই বইটি প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু লুডভিগ ফন্ ফিকারকে বলেন— 'ট্র্যাক্টেটাসের মূখ্য নির্দেশ হল নৈতিক'— অর্থাৎ ভাষ্যকারেরা যে এটিকে যৌক্তিক দর্শন বা বিশ্লেষণী দর্শনের গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন— তা গ্রন্থকারের মনঃপূত ছিল না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন বইটি হল নীতিতত্ত্ব বিষয়ক। অদ্ভুতভাবে তিনি নীতিতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ও ধর্মভাবনাকে এক গোত্রীয় বা একই মনে করে থাকেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কেউ বলতে পারেন— তবে তো বইটির মূখ্যার্থ

হল নন্দনতাত্ত্বিক বা ঈশ্বরতাত্ত্বিক। অথচ এ বিষয়গুলি সর্ম্পকে তিনি এই গ্রন্থে বিশেষ বাক্যব্যয় করেননি। এ ধোঁয়াশা কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রথম চিঠিটির উপদেশ অনুযায়ী আমরা বইটির মুখবন্ধ ও সিদ্ধান্তের বক্তব্যটা বিশদ করি। বইটির মুখবন্ধে ও সিদ্ধান্তে আমরা দেখি তিনি একই কথা লেখেন— 'যা বলা যায় তা স্পষ্ট করেই বলা যায়- আর যা বলা যায় না— সে সম্বন্ধে চুপ করে থাকাটাই ভালো।'

অর্থাৎ এই বইটিতে তিনি যে সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি, সেই গুলিই তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশ আমরা ভিয়েনা চক্রের আলোচনাসভায় প্রত্যক্ষ করি। মরিৎজ শ্লিকের আমন্ত্রণে যখন তিনি ভিয়েনা চক্রের আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তখন সেখানে তিনি ট্র্যাক্টেটাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার পরিবর্ত্তে শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরে উদাত্ত কণ্ঠে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করতেন।

ভাষ্যকার রেমঙ্ক বলেছেন যে হয়তো এভাবেই তিনি ভিয়েনা চক্রের দার্শনিকদের কাছে এই বার্ত্তা দিতে চেয়েছিলেন যে তাঁর কাছেও 'যে কথাগুলো বলা গেল না'— সেগুলিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং 'যে কথা বলা যায় না, সে কথা না বলাই ভালো।' অবশ্যই যা বলা যায় না— তা কিন্তু দেখানো যায় অর্থাৎ যা দেখা যায় তার মধ্য দিয়েই যত না বলা কথা আত্মপ্রকাশ করে।

ভিটগেনষ্টাইন-পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা 'যা বলা যায় না'— তার সম্বন্ধেই বেশী বলেছেন। ভিটগেনষ্টাইনের মতে, তাঁরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ করতে চান, তা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়— অর্থাৎ এই বচনগুলি অর্নিবচনীয়কে প্রকাশ করার, অব্যক্তকে ব্যক্ত করার অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। ভিটগেনষ্টাইনের মতে, এই অক্ষম প্রচেষ্টাই অর্থহীনতার উদ্রেক করে থাকে। আর একটু গুছিয়ে বলি। নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা— এই ধরণের অর্থহীনতার আওতায় পড়ে কারণ এখানে ব্যবহৃত বাক্যগুলি তথ্যজ্ঞাপক নয়। তাদের বক্তব্য বিষয়গুলি অতিপ্রাকৃত, যেহেতু আমাদের ভাষা কেবল প্রাকৃতকে বর্ণনা করতে পারে, তাই অতিপ্রাকৃতকে ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও যে দার্শনিকেরা ভাষা ব্যবহার করে এগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন— আর আমরা যে বোঝবার চেষ্টা করেছি— এই সমস্ত প্রচেষ্টাই তাই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাই অর্থহীনতার পরিচায়ক, ভিটগেনষ্টাইন অবশ্য

আমৃত্যু এই অর্থহীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন— যেসব মানুষেরা নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, অধিবিদ্যা বা ধর্ম সম্বন্ধে বলতে বা লিখতে চান, তাদের মধ্যে ভাষার সীমা লঙ্ঘন করার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং তিনি নিজে উপলব্ধি করেন যে তিনি নিজেও এর ব্যতিক্রম নন। এই সীমা লঙ্ঘন করার প্রবণতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তিনি কখনো একে উপহাস করতে পারেন না।

এই পটভূমিকায় আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশ্চর্য সংযমী ও বলা যায় প্রায় নীরব। এই নীরবতা প্রসঙ্গেই ভিটগেনষ্টাইন ভাষ্যকারেরা মূলতঃ দু-টি ভাগে বিভক্ত। (এক) একদল ভাষ্যকারেরা মনে করেন নীরবতার অর্থ হলো সেখানে সরব হবার মত কিছুই নেই। যা আছে তা নিতান্তই অর্থহীন, এঁদের পাঠকে বলা হয় Resolute Reading বা অটল পাঠ। এঁদের মধ্যে আছেন জেমস্ কোনান্ট, কোরা ডায়মণ্ড, মেরী ম্যাকগিন এবং অন্যান্যরা, যাঁরা মনে করেন এই নীরবতা গর্ভবতী নীরবতা নয় অথবা এই নীরবতা অর্নিবচনীয়ের পবিত্রতা রক্ষাকারী নীরবতা নয়। এটির সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি কারণ এখানে বলার মতো কিছু নেই। অন্যদিকের ভাষ্যকারেরা মনে করেন অবশ্যই তেমন কিছু আছে, যা আমাদের প্রাত্যহিকের ভাষা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। এই দলের ভাষ্যকারদের মধ্যে আছেন G.E.M. Anscombe, A. Kenny, Norman Malcom প্রমুখ। আবার এই দু-ই দলেরই অর্থহীনতা ও নীরবতা সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলিকে আপাত-বিরোধী বলে দেখিয়েছেন অসকারী-কুজেলা।

যাইহোক্ এই ভাষ্যকারদের বির্তকে না ঢুকে আমরা এবার দেখি PI তে তিনি ভাষা, ভাষার সীমানা ও ভাষাতীতকে কিভাবে দেখেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্ ও ভাষার সীমানা

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো ভিটগেনষ্টাইনের ভাষার সীমানা ও ভাষাতীতের ধারণা কিরকমভাবে বিবর্ত্তিত হয়েছে পরবর্ত্তীকালের রচনায়। আমরা দেখেছি ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী ভাষার সীমানা নির্ধারিত হয় ভাষার যৌক্তিক পরমাণু যে নাম, সেই নাম সমন্বিত মৌল বচনের সমষ্টি দিয়ে। আমার কাছে সকল মৌল বচনের উপস্থিতি মানেই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ভাষার উপস্থিতি।

তাই মৌল বচনসমুদায় দিয়েই রচিত হয় ভাষার সীমানা। মৌল বচনগুলি যেমন নামের সমষ্টির দ্বারা সীমায়িত হয়, তেমনই তথ্য সীমায়িত হয় ট্র্যাক্টেটাসীয় বস্তুশৃঙ্খলের দ্বারা। আর সেই তথ্য সমুদায়ই নির্ধারিত করে দেয় জগতের সীমানা। জগতের সীমানার উল্লেখ করা এখানে এ কারণেই প্রয়োজন যেহেতু তরুণ ভিটগেনষ্টাইন বিশ্বাস করতেন যে ভাষার সীমা আর জগতের সীমা একই জায়গায় এসে মিলে যায়। এবং ট্র্যাক্টেটাসে পূর্বতঃসিদ্ধ যুক্তির আলোকে এই মিলকে দেখানোই ছিল তার প্রধান কর্ত্তব্য।

পরিণত ভিটগেনষ্টাইনে আমরা লক্ষ্য করি যে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব— এ ধারণা তিনি পরিত্যাগ করেছেন। পরিত্যাগ করেছেন যৌক্তিক পরমাণুর ধারণা— যার সাথে নাম ও মৌলবচন একদিকে আর অন্যদিকে বস্তু ও আনবিক তথ্যের ধারণাও পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই ভাষার ধারণা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সীমানার ধারণাও পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। এখন দেখি পরিণত ভিটগেনষ্টাইন ভাষা নিয়ে কি ভাবছেন— এ পর্যায়ে তিনি ভাষাকে বুঝতে পরতঃসাধ্য পদ্ধতিতে ভাষার দৈনন্দিনের ব্যবহার ও ভাষা-ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর জীবন-যাপনের বিশ্লেষণকেই হাতিয়ার করেছেন। অবশ্য ভাষা ও তার কার্যকলাপের বিশ্লেষণ যে দার্শনিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ— সে বক্তব্য থেকে তিনি সরে আসেন নি। তিনি বলছেন—

> "দার্শনিক সমস্যাগুলো আভিজ্ঞতিক বা অভিজ্ঞতাবিষয়ক সমস্যা নয়, ভাষার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের দিকে সঠিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে তবেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।"[৪]

অর্থাৎ পরিণত ভিটগেনষ্টাইনও মানছেন দার্শনিক সমস্যাগুলোর সমাধান ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে এই বিশ্লেষণের প্রকৃতি ট্র্যাক্টেটাসের পূর্বতসিদ্ধ যৌক্তিক বিশ্লেষণের থেকে একদমই আলাদা। এখানে তিনি দৈনন্দিনের ভাষা ও তার কার্যকলাপের দিকে নজর দিতে বলছেন, বলছেন কিভাবে একটি শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হতে হতে অর্থকে অর্জন করে-কিভাবে বিনা ব্যবহারের শব্দ অর্থহীন হয়ে পড়ে তার দিকে নজর দিতে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন সময়ের ধারণা— এই ধারণা নিয়ে দার্শনিক মহলে সমস্যার অন্ত নেই।

এই 'সময়' শব্দটি 'রাম', 'শ্যাম', 'টেবিল', 'চেয়ার' ইত্যাদি যাদের নির্দ্দিষ্ট দ্যোতক বাহ্যবস্তু আছে— তাদের থেকে আলাদা— কারণ সময়ের দ্যোতক কোন বাহ্যবস্তু জগতে নেই।

তবু কিন্তু সময় সংক্রান্ত আলাপচারিতা— যেমন ট্রেনটি কোন্ সময়ে ছাড়বে? পরীক্ষার দিন কবে স্থির হলো? ইত্যাদি আমাদের ভাষায় যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব, কারণ এই প্রশ্নগুলি কিছু বাস্তব ও কিছু সম্ভাব্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই তোলা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বাস্তব ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করে যদি প্রশ্ন তোলা যায় 'সময় কি?' তবে তার জবাব আর মেলেনা। এ প্রসঙ্গে ভিটগেনষ্টাইন অগাস্টিনের লেখার উল্লেখ করেছেন—

> "সময় কি? কে একে চট করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারে? কে সময় সর্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতে পারে? অথচ সময় সর্ম্পকে সত্যিই কি আমরা কিছু জানিনা? যখন আমরা এ নিয়ে কথা বলি, তখন বুঝি, যখন অন্যেরা বলে, আমরা শুনি, তখনো বুঝি, তবু 'সময় কি?'— এই প্রশ্ন আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা না করে, তবে আমি জানি, যদি জিজ্ঞাসা করে ও ব্যাখ্যা চায়— তবে আমি জানি না।"[৫]

কিন্তু কেন আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না? কারণ যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি সময়কে সব পরিস্থিতির ঊর্দ্ধে কল্পনা করে, সকল সাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে সর্ম্পক ছিন্ন করে প্রশ্ন তুলছেন— তাই তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। আর এভাবেই যখন কোন দার্শনিক শব্দকে তার স্বাভাবিক সঞ্চারের পরিস্থিতি থেকে দূরে সরিয়ে এনে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুরু করেন, তখনই দার্শনিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ভাষায় শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হয়— তার দ্বারাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার অর্থ নির্ধারিত হয়— এই ধারণাই তাঁর ট্র্যাক্টেটাসের ভাষার সীমানার ধারণার মূলে আঘাত করে। আমরা দেখেছি ট্র্যাক্টেটাসে ভাষার সীমানা নির্ধারিত হয় প্রাথমিক পর্যায়ে মৌল বচন সমূদায় ও পরবর্ত্তী পর্যায়ে ভাষার যৌক্তিক পরমাণু 'নাম' এর সাথে জগতের যৌক্তিক পরমাণু- 'বস্তু'র মেলবন্ধনে। এখানে তিনি দেখাচ্ছেন— নাম সবসময় বস্তুকে নির্দেশ করে না। এবং না করলেই যে সে অর্থহীন তাও নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাক্য হতে গেলে যে নামপদ সমাহার হতে হবে— তাও ঠিক নয়। একপদী বাক্যও সম্ভব। ট্র্যাক্টেটাসে তিনি বলেছেন, নামের সারধর্ম যেমন বস্তুকে নির্দেশ করা, তেমনি বাক্যের সারধর্ম হ'ল ঘটনার বর্ণনা দেওয়া। *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌সে* এসে পরিণত ভিটগেনষ্টাইন মনে করছেন ভাষার কাজ শুধু বর্ণনা দেওয়া নয়, তার আরো অনেক কাজ

আছে। সে সকল কাজই বাক্য দ্বিধাহীনভাবে সম্পন্ন করে থাকে। আর ভাষার অসংখ্য অজস্র কাজের ভিড়ে ঘটনার বর্ণনা দেওয়াটা একটা সামান্য কাজ মাত্র। তাকেই একমাত্র কাজ বল্লে ভাষার অনেকান্তিক স্বরূপ উন্মোচন কখনোই সম্ভব হবে না। আর একে সারসত্য বলে বাক্যের সংজ্ঞা দিলে তা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে।

অবশ্য পরিণত ভিটগেনষ্টাইন একথা বলছেন না যে, বাক্য কখনো ঘটনার বর্ণনা করে না। তিনি বলতে চাইছেন যে দৈনন্দিনের ভাষা-ব্যবহারকে খুঁটিয়ে দেখলেই তার মধ্য দিয়েই ভাষার অনেকান্তিক সত্য উদ্ভাসিত হয়। তিনি এ পর্যায়ে যুক্তি দিয়েছেন: 'চরমতম সরল' বা 'চরমতম জটিল'— এই বাক্যংশ অর্থহীন। কারণ এগুলির সাথে কোন প্রসঙ্গ বা কোন প্রেক্ষিত উল্লিখিত হয়নি। তাঁর মতে, 'চূড়ান্ত সরল' বা 'চূড়ান্ত জটিল' কথাগুলি অর্থপূর্ণ হবে তখনই যখন কার প্রেক্ষিতে জটিল বা কার প্রেক্ষিতে সরল— সে বিষয়ের উল্লেখ থাকবে; প্রসঙ্গতঃ প্রেক্ষিতের উল্লেখ না থাকলে ভাষাতে এগুলি অর্থবহ চিহ্ন রূপে গণ্য হবে না। তাই যদি হয় তবে ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী ভাষার যৌক্তিক পরমাণু হিসেবে চূড়ান্ত সরল 'নাম' ও অর্থহীন। শুধু তাই নয়, চূড়ান্ত সরল 'বস্তু' যা কিনা জগতের যৌক্তিক পরমাণু হিসেবে ট্র্যাক্টেটাসে স্বীকৃত ছিল— তার অস্তিত্বও মানা সম্ভব নয়, যেহেতু 'চূড়ান্ত সরল' বলেই কিছু হয় না, উপরন্তু আগেই দেখেছি নাম ও বস্তুর মধ্যে যে অটল গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে মানা হয়েছিল ট্র্যাক্টেটাসে— তাও এখানে অর্থহীন হিসেবে পরিত্যক্ত হ'ল। ভাষায় নামের যদি অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব না থাকে— তবে তাদের সমাহারে অর্থপূর্ণ মৌলবাক্য গঠিত হবার সম্ভাবনাই রইল না। যেহেতু মৌলবাক্য সমূদায় দ্বারাই ট্র্যাক্টেটাসের 'ভাষার সীমানা' নির্ধারিত ছিল— এখানে সেই সীমানার ধারণাটি নামের অর্থহীনতার সাথেসাথে তাসের ঘরের মতোই ভেঙ্গে পড়লো।

এবারে আসি অর্থপূর্ণতার সীমানা প্রসঙ্গে। *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্*- এ তিনি বলেন 'কোন রচনাটি অর্থপূর্ণ হবে আর কোন রচনাটি হবে না— তা নির্দেশ করবে প্রসঙ্গ। অর্থাৎ অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতার পার্থক্যটিও অটল, চিরন্তন নয়। আজ যা এক প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ, কাল তা অন্য প্রসঙ্গে অর্থহীন হতেই পারে। তাদের অর্থপূর্ণতা বা অর্থহীনতাকে চূড়ান্ত ভাবার কোন যুক্তি নেই অর্থাৎ অর্থপূর্ণ ভাষার সীমানার ধারণাও এখানে ধুলিসাৎ হয়ে গেল।'

এবারে আসি ভাষাতীত প্রসঙ্গে। ভাষার সীমানার ধারণা যদি অটুট না থাকে, তবে ভাষাতীত, যা কিনা সীমানার বাইরে— তার ধারণাই বা অটুট থাকে কি করে? যাইহোক্ আমরা

আগেই দেখেছি যে, ভাষাতীত অর্থাৎ অনির্বচনীয় বিশেষ বস্তু হতে পারে আবার বিশেষ অভিজ্ঞতাও হতে পারে। যাই হোক্ না কেন, তা তো বচনীয় হতে পারে না সাধারণ ভাষায়। পরিণত ভিটগেনষ্টাইন মনে করেন— যা বচনীয় তা কখনো গোপন হতে পারে না, কখনো ব্যক্তিগত হতে পারে না। *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্-* এ তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত ভাষার ধারণা গ্রহণ যোগ্য নয়— তাই যা কিছুই ভাষাতীত তা কোন ভাষাতে প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং তা সর্ম্পকে আমার জ্ঞান হবে কি করে? তা যদি সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় প্রকাশ হতে না পারে— তাহলে ভাষাতীতের প্রকাশ হয় কিভাবে? তবে কি এটির ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ সম্ভব? ভিটগেনষ্টাইন ব্যক্তিগত ভাষা প্রসঙ্গে বলছেন—

> "যে ভাষায় শব্দের অর্থ কেবলমাত্র সেই ভাষা-ব্যবহারকারীর কাছেই বোধগম্য বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সেই শব্দগুলি কেবলমাত্র বক্তার ব্যক্তিগত অনুভূতির (যা অন্যের কাছে কেবল দুরধিগম্য নয়-চির অনধিগম্য তার নির্দ্দেশক হবে।"[৬]

অর্থাৎ ভিটগেনষ্টাইন এখানে ব্যক্তিগত ভাষা বলতে ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীর সংকেতলিপি বা অন্য কোন ধরণের সাংকেতিক ভাষাকে বুঝছেন না। কারণ এইসব ব্যক্তিগত গোপন ভাষাগুলির সবসময়েই সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে— অর্থাৎ এই ভাষার সর্বজনীন ভাষা হবার যৌক্তিক সম্ভাবনা আছে। ভিটগেনষ্টাইনের মতে একটি শব্দ যখন সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তখনই তা অর্থযুক্ত হয়। অর্থাৎ শব্দটি তখনই ভাব আদান-প্রদানের কাজে সক্ষম হয়, কারণ তখন শব্দটির ব্যবহার (কি অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে, সে) সর্ম্পকে ব্যবহারকারীদের মতদ্বৈধ থাকে না। শব্দ ব্যবহারের নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবহার বা প্রথার নিয়মিত অনুসরণে। তাই কোন একটি শব্দের ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হ'ল কিনা— তা আমরা শব্দ ব্যবহারের প্রচলিত প্রথার মানদণ্ডের নিরিখেই যাচাই করে নিতে পারি।

ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্- এ তিনি যে যুক্তি দেন, তা হল: কোন পদকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার (একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার) করতে চাইলে তা অর্থহীন হবে। কারণ সেক্ষেত্রে শব্দটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হ'ল কিনা— তা বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না। যদি সত্যিই কোন মানদণ্ড না থাকে তবে শব্দের প্রয়োগ যে যথার্থ— এ বিষয়ে নিছক প্রতীতি এবং শব্দটি যথার্থই প্রযুক্ত— এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

তিনি আরো যুক্তি দেন যে, যদি কেউ কখনো জানতে না পারে– আমি 'ভালোবাসা' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করছি— তাহলে অন্য কেউ কোনদিন জানতে পারবেন না— অন্য কেউ যে অর্থে 'ভালোবাসা' শব্দটি ব্যবহার করছেন— সেই অর্থগুলির সঙ্গে আমাকৃত অর্থের সাযুজ্য আছে কিনা। আবার মানসিক যন্ত্রনার অর্থ যদি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে হয়, তবে 'যন্ত্রণা' বলতে যে সবাই একই ধরণের অনুভূতিতে বোঝাচ্ছে— তা মানার কোন উপায়ই থাকবে না। অতএব ভিটগেনষ্টাইনের মূল বক্তব্য হল— কোন শব্দ যদি সার্বিক ভাষায় অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই শব্দের অর্থ বা বিষয় কখনোই ব্যক্তিগত হতে পারেনা।

এই ব্যক্তিগত ভাষার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি তাই আমাদের ভাবতে বাধ্য করে: তাহলে ভাষাতীতের ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় এলো কি করে? আমরা সবাই বুঝি 'ভাষাতীতের' অর্থ কি? কিন্তু এই অর্থ আমরা পেলাম কি করে? অবশ্যই কোন বিষয় থেকে নয়, তবে কোথা থেকে এলো এর সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ? *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্‌* অনুযায়ী ভাষাতীত শব্দটি কিভাবে সার্বিক ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে— তার উপর নির্ভর করেই শব্দটির অর্থ গড়ে উঠছে।

ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্‌ - এ ভিটগেনষ্টাইন আরো যে বিষয়ে গুরুত্ব দেন তা হল— বর্ণনা করাই দার্শনিকদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়। দার্শনিকেরা সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান বলেই সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। দার্শনিকদের এই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তাঁর কাছে অসুস্থতারই নামান্তর। এই অসুখ সারবে যদি দার্শনিকেরা ব্যাখ্যা করার বদলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ভাষাতীত বা অর্নিবচনীয়কে ব্যাখ্যা করার বদলে যদি আমরা বর্ণনা করি কিভাবে এই শব্দগুলো ভাষাতে অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল ভাষা ব্যবহারের নিয়মগুলো জানা ও ঠিকমতো তা অনুসরণ করা। পরিণত ভিটগেনষ্টাইন মনে করেন দৈনন্দিনের ভাষা সবসময়েই ভাষা ব্যবহারের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই নিয়মগুলি কিন্তু সর্বজনীন, ব্যক্তিগত নয়। নিয়মগুলি সর্বজনীন বলে এগুলি সহজেই শেখা ও শেখানো সম্ভব।(PI 179, 198, 201, 206, 216)
তিনি যেমন একদিকে মনে করেন যে ভাষা ব্যবহারের নিয়ম সকল ক্ষেত্রে মেনে চলা জরুরী— তবুও তিনি এটাও মানেন যে, নিয়মগুলি সবক্ষেত্রে অনমনীয় নয় এবং কোন শব্দের সফল ভবিষৎ ব্যবহারকেও সে নিয়ন্ত্রন করে না। অর্থাৎ 'অনির্বচনীয়' বা 'ভাষাতীত' শব্দের ব্যবহার বা সন্দর্ভ সামজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মগুলি দেখায়— 'যা বলা

যায় না— তা কিভাবে বলতে হয়।' এই যে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা, অর্নিবচনীয়কে বচনীয় করার প্রচেষ্টা, যা তিনি ট্র্যাক্টেটাসে 'অর্থহীন' বলে দাবী করেছেন— এটার মধ্যে পরিণত ভিটগেনষ্টাইন এক ধরণের নিয়ম-প্রতিহত করার প্রবণতাও দেখতে পান।

তাহলে ট্র্যাক্টেটাসে যে 'ভাষাতীত' বা 'অর্নিবচনীয়ের সাক্ষাৎ পাই, *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* - এ তিনি তাঁর থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। ব্যক্তিগত ভাষার অসম্ভাব্যতার যুক্তিগুলি দেখায় সর্বজনীন ভাষা অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু স্বীকার করার যো নেই আমাদের। তাই 'অর্নিবচনীয়' বিষয় বা অভিজ্ঞতার সন্ধান না করে আমাদের বর্ণনা করা উচিৎ যে কিভাবে এই শব্দবন্ধ অর্থপূর্ণ ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবং এই ব্যবহার-সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার নিয়মানুসরণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এই কারণেই *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* - এ ভিটগেনষ্টাইন আমাদের ভাষাতীত যে অর্নিবচনীয়— তার সম্বন্ধে অন্যরকম প্রশ্ন করতে বাধ্য করেন। যেমন অর্নিবচনীয় বিষয় বা অভিজ্ঞতা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন না তুলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিৎ— কিভাবে এগুলি ভাষায় প্রকাশিত হয়? আবার ভাষাতে যে পদ অর্নিবচনীয় বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে (যেমন জগৎ আছে— এতে আমি বিস্মিত)— সে সম্বন্ধে কি আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়? এর পরিবর্তে আমার প্রশ্ন করা উচিত— কিভাবে একজন যে ভাষাখেলায় অর্নিবচনীয়ের ব্যবহার আছে, সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে?

এই ধরণের প্রশ্ন আমাদের ভাষাতে শব্দের আধিবিদ্যক ব্যবহার থেকে সাধারণ ব্যবহারে ফিরিয়ে আনতে পারে। শুধু তাই নয় যা প্রকাশ করা (articulate করা) শক্ত তাকে আধিবিদ্যক অর্থ দেওয়ার প্রলোভন থেকে ও মুক্ত করে।

পরিশেষে তাই এ কথাই বলতে পারি যে, পরিণত ভিটগেনষ্টাইন 'ভাষার সীমানা' ও 'ভাষাতীত'র ক্ষেত্রে *ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্‌স্* - এ এক নতুন চিন্তার দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেন।

References:

১. Wittgenstein Ludwig (1922), *Tractatus Logico-Philosophicus*, Translated by D. F. Pears and B. F. McGuinness, London, Routledg & Kegan Paul, p. 74

২. *Engelmann Paul (1967), Letters from Wittgenstein: with a Memoir*, Edited by B. F. McGuinness. Translated by L. Furtmüller; Oxford, Basil Blackwell, pp. 143-144

৩. Monk Ray, 1990, *Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius*. New York: Macmillan. p. 164

8. Wittgenstein Ludwig (1983), *Philosophical Investigations*, G. E. M. Anscombe, Oxford, Basil Blackwell, par. 109

৫. Edward B Pusey (1949), Trans. *The Confessions of St. Augustine*, New York: Modern Library, p. 253

৬. Wittgenstein Ludwig, *Philosophical Investigations*, par. 243